ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক বাংলা চর্চা ও একাডেমিক ভাষা সরণ

হাকিম আরিফ*

সারসংক্ষেপ : একাডেমিক ভাষা সরণ একুশ শতকের প্রথম দিককার একটি প্রধান ফেনমেনন। বিশ্বায়নের প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের পরিচয়ধারী দেশসমূহ তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে প্রধান বা জাতীয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে সরণ বা বদল ঘটাচ্ছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষার সরণ বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধকার ভাষা-কোর্সের শিক্ষক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে ভাষা বদলকারী বিভাগের শিক্ষকদের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে যে তথ্য লাভ করেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। এতে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বের জ্ঞানচর্চার সাথে তাল মেলানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এ ধরনের ভাষা সরণ ঘটিয়েছেন। তবে একাডেমিক ভাষা সরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির ওপর নির্ভর করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষার্থী কারুরই মতামত গ্রহণ করেননি। কিন্তু বিদেশে এ ধরনের ভাষা সরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের পার্লামেন্টের মতামতসহ আইন প্রয়োগ ছাড়া তা সম্ভব নয় (Altbach 2007; Kagwesage 2012)। প্রবন্ধে আরও আলোচিত হয়েছে যে, এ ধরনের ভাষা সরণের কারণেই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলার চর্চা ও প্রয়োগ ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। তবে একটি জাতির সৃজনশীলতা রক্ষা ও তার বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেহেতু দেশীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার বিকল্প নেই, এই বিশ্বায়নের পর্বে একাডেমিক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দেশীয় বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ইংরেজির মধ্যে সমন্বয় সাধনের নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। এই প্রবন্ধের শেষভাগে তা আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোন ভাষার পঠন-পাঠন ওই ভাষাটির উন্নতির একটি নির্দিষ্ট মাত্রাকে নির্দেশ করে। পাশাপাশি, একটি ভাষা যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষা, দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করে আসছে। কিন্তু সময় যত বহমান হচ্ছে, অন্যভাবে বলতে গেলে, সময়ের প্রবহমানতার সাথে আমাদের জাতিগত মেধা যত

* অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিপক্ব হচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে যে বাংলা ভাষাকে যেন আমরা তার দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অব্যাহতি দিয়ে তার পরিবর্তে বিশ্বায়নের ভাষা ইংরেজিকে আবার এখানে প্রতিস্থাপন করছি। বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই অবস্থাটি অত্যন্ত প্রকট। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনার কথা বলা মূলত কোন নিষিদ্ধ বাণী উচ্চারণ করারই শামিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষাশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত না হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের উৎকট প্রকটতা বর্তমান না থাকলেও এক রকম সংগোপন বা আড়াল করার নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষণীয়। অর্থাৎ ৯৮% শতাংশ বাঙালি জনগণের কষ্টের টাকায় পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বাংলাকে নির্বাসন দেওয়ার আয়োজনটা সম্প্রতি গোপনেই সেরে ফেলা হয়েছে। এই বিবেচনায়, এই বর্ণনামূলক প্রবন্ধে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক বিষয় হিসেবে বাংলার পঠন-পাঠন, শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাংলার ব্যবহারের প্রকৃতি ও স্বরূপ, একাডেমিক ভাষা হিসেবে সম্প্রতি বাংলা থেকে ইংরেজিতে সরণ (academic language shift) এবং এক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের বর্তমান মানসিকতার বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে।

১. বিদ্যায়তনিক বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভাষার পঠন-পাঠন বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই নিচের দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উত্থাপিত হতে পারে।

১) একটি ভাষা কেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান করতে হয়?

২) কখন ভাষাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠন বা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায় যে, সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানুষের মাঝে নিজেকে অন্যের কাছে তুলে ধরা বা প্রকাশের একটি উত্যঙ্গ ইচ্ছা বর্তমান। এখন বিষয়টি ভাষিকগোষ্ঠীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সামষ্টিকভাবে একটি ভাষিক-জাতিও তার সমস্ত গর্ব, সম্ভাবনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভাষার মাধ্যমে চিরস্থায়ী রূপ দেয়। আর একটি জাতির এই সামষ্টিক অহংবোধকে অন্যের কাছে তুলে ধরার ভাবনাটাও সমানভাবে কার্যকর থাকে। ফলে ঐ ভাষিক-জাতি জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক ধাপ থেকে সর্বোচ্চ স্তরে তার ভাষাকে একটি বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করাকে তার এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের এক অনিবার্য দায়িত্ব হিসেবে মনে করে। আর এ ধরনের বাস্তবায়নটা তখন ঐ ভাষাভাষীর আবেগের অংশ হয়ে যায়। এছাড়া এক্ষেত্রে কেউ কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চার করাকে নিজস্ব জাতিসত্তা ও তার সংস্কৃতির পরিপূর্ণতার সূচক হিসেবে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ সালে তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণে বলেন, 'I firmly beleive

that we can not have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars' (উদ্ধৃত, মহাপাত্র ১৯৯৫: ক-১৭)। ভট্টাচার্য তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ-অংশকে বাংলায় অনুবাদ করেন এভাবে, "যদি না মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানকে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় তাহলে জাতি হিসেবে আমরা পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপক সংস্কৃতি অর্জন করতে সমর্থ হব না" (ভটাচার্য ১৯৮৫: ৬৫)। আবার কারও কারও মতে, ভাষার পরিপক্বতা সাধন ও তার সমৃদ্ধিকল্পেও একাডেমিক ক্ষেত্রে তার পঠন-পাঠন করা জরুরি।

এখন প্রথম প্রশ্নটির শেষের অংশের সাথে দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর অনেকটা সম্পর্কিত হলেও বিষয়টিকে অন্যভাবেও বলা যায়। একটি ভাষা তখনই বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে পঠন-পাঠনের উপযোগী হয়ে ওঠে, যখন ভাষাটির একটি প্রমিত লিখন রূপের বিকাশ ঘটে। মূলত এই লিখিত রূপের মাধ্যমে ঐ ভাষীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপায়ণটিও সমৃদ্ধ হয়। আর ভাষাটির শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি একে কাজের ভাষায় পরিণতও করতে হয়। অর্থাৎ শুধু সাহিত্য, কলা বা সংস্কৃতি প্রকাশের বাহন হিসেবেই নয়, বরং অর্থনীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি সকল বিষয় সম্পর্কিত ভাবের প্রকাশ রূপেও এটিকে সমর্থ হয়ে উঠতে হয়। উপরিউক্ত এ দুটি বক্তব্যের আলোকে সাম্প্রতিককালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে কীভাবে চালু হয়েছে, তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ভট্টাচার্য তাঁর রচিত "শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার প্রবর্তনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রবন্ধে" (১৯৮৫)। এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের অবহিত করছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণে অর্থাৎ ১৮৯১ খিস্টাব্দে আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনে অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার যে অন্ধকার ছড়িয়ে আছে, তার অপনোদন হতে পারে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিলে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে স্যার গুরুদাস শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভট্টাচার্যের বর্ণনা থেকে জানা যায়, স্যার গুরুদাস আবার ১৮৯২ সালের সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেছিলেন—

> যে কঠিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা দিই — আমাদের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃতির পার্থক্য দুস্তর। আমাদের বিদ্যালয় যে মৌলিক চিন্তা জাগ্রত করাতে সমর্থ হই না এইটি তার একটি মুখ্য কারণ। এই রকম একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনুকরণের প্রয়াসই প্রাধান্য পায়। আর এই অনুকরণের অভ্যাস ক্রমে ক্রমে এমনই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তাছাড়া যে দুর্মূল্য বিদেশী বেশবাস দিয়ে আমাদের ছাত্ররা আপন আপন ভাবনাকে সজ্জিত করতে বাধ্য হয় তার জন্যে তাদের মনঃশক্তির এতই অপচয় ঘটে যে তাদের চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (উদ্ধৃত, ভট্টাচার্য ১৯৮৫: ৬৪)

ওপরের উক্তিতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুদাসের যে শিক্ষাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান তা নিঃসন্দেহে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়বাহী। অর্থাৎ তিনি আমাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন যে, বিদেশি ভাষায় ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে গেলে শিক্ষার্থীদের যে শ্রম ও প্রচেষ্টা দিতে হয় তাতে তাদের সৃজনশীল চিন্তার আর অবকাশ থাকে না।

ভাষা বিষয়ে গুরুদাসের এই প্রাজ্ঞ ভাবনার প্রায়োগিক রূপ আজকের পৃথিবীতেও বিরল নয়। উদাহরণস্বরূপ, আজকের বৈশ্বিক বিদ্যায়তনে অ্যাংলো-আমেরিকানদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাঁরা যেহেতু মাতৃভাষায় বৈশ্বিক জ্ঞান চর্চা করে, সেহেতু এক্ষেত্রে তাঁদের সৃজনশীলতা অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে বেশি। যার ফলে সারা পৃথিবীতে নতুন জ্ঞান সৃজন ও বিতরণে তাঁরা চালকের আসনে বসেছে। একই ঘটনা ঘটেছিল মধ্যযুগের ইউরোপে, বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকে যখন লাতিন ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানচর্চার একমাত্র ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এবং সে কারণে ইউরোপের একাডেমিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও এর অনুসারীরা একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছিল (Altbach 2007)।

কিন্তু উপাচার্য হিসেবে স্যার গুরুদাসের এই যুক্তিনিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম বা বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে আমাদের ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেননা, এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে অনেকের বিরোধিতার দিকটিও লক্ষণীয়। তবে বাংলাকে বিভিন্ন একাডেমিক বিষয় প্রকাশের উপযোগী করার জন্য পণ্ডিতদের সে সময় অনেক পরিভাষাও নির্মাণ করতে হয়েছিল। সর্বোপরি, ভট্টাচার্য আমাদের জানাচ্ছেন যে, গুরুদাসের এই ভাষণের প্রায় ৪০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ১৩ই আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজি ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব পাস হলেও সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায় আরও তিন বছর পরে ১৯৩৫ সালে। সবশেষে, ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার বিধান কার্যকর হয়, যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৯ সাল থেকেই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একাডেমিক বিষয় হিসেবে বাংলার পাঠদান শুরু হয় (ভট্টাচার্য ১৯৭৪)।[১]

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা চর্চা : একটি খতিয়ান

নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূখণ্ডের প্রথম উচ্চশিক্ষার দ্বার হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় এখানকার মানুষের আধুনিক মানস গঠনে ভূমিকা রেখেছে। একইভাবে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে একটি অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যার পরিণতিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

এখন আমরা যদি একাডেমিক দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার স্থানকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের পঠন-পাঠন বা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর উপযোগিতার বিষয়টিই মুখ্য হয়ে ওঠে। এই বিবেচনায় বিষয়টিকে নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যেতে পারে।

ক. একাডেমিক বিষয় হিসেবে বাংলা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন

খ. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার

গ. বাংলা ভাষা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা

২.১ একাডেমিক বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক বিষয় হিসেবে বাংলার অধ্যয়ন শুরু হয় দুইভাবে - ১) সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ও ২) বাংলা ভাষা হিসেবে। ইব্রাহিম (১৯৭৪) ও ভট্টাচার্য (১৯৭৪) জানাচ্ছেন, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধীনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সাল ১৯২১ থেকেই, অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের ঠিক দু বছর পরেই। ভট্টাচার্য আরও জানাচ্ছেন যে, কলকাতার দুই বছর পরে ঢাকায় বাংলা সাহিত্যের পঠন শুরু হলেও বেশ কিছু কারণে এটি অনন্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। প্রথমত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রথম থেকেই পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়েছিল, যেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অনেক পরে। অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সংস্কৃত অধ্যয়নকে প্রথম থেকেই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে শিক্ষার্থীদের আবশ্যিকভাবে সংস্কৃতের ব্যাকরণসহ বিভিন্ন কোর্স অধ্যয়ন করতে হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময়ে ভাষা হিসেবে বাংলার পঠন-পাঠন শুরু হয় বাংলা বিভাগেরই অধীনে। এই বিভাগের ১৯২১ সালের পাঠক্রমে দেখা যায়, ঠিক বাংলা ভাষা শিরোনামে কোনো কোর্স না থাকলেও শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 'ভাষাতত্ত্ব', 'বাংলা রচনা' ইত্যাদি কোর্স অর্ধেক পত্র হিসেবে পড়তে হতো। পরে এই বিভাগে যখন স্নাতক পর্যায়ে অনার্স কোর্স চালু হয়, তখন সাহিত্যের কোর্স বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের কোর্সও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। অর্থাৎ বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপকেরা এই বিভাগে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কোর্স অধ্যয়নের পাশাপাশি বাংলা ভাষার পঠনকেও সমান গুরুত্ব দিতেন। এটিই আশির দশক পর্যন্ত বাংলা বিভাগে কোর্স নির্বাচনের এক ঐতিহ্যবাহী অনুসৃত রীতি হিসেবে পালিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা বিভাগে ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে ছেদ পড়ে। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ এই ধারণা পোষণ করতে শুরু করেন যে, যেহেতু ভাষাবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিভাগ রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, সেহেতু বাংলা বিভাগে ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান

বিষয়ে এ ধরনের অধিক সংখ্যক কোর্স চালু রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ফলে বাংলা বিভাগে ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের কোর্স বর্তমানে লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। তাছাড়া ইংরেজি বিভাগের পাঠক্রমের সাথে যদি বাংলা বিভাগের পাঠক্রমের তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, ইংরেজি বিভাগে এমএ পর্যায়ে যেমন সাহিত্য ও ভাষার আলাদা ধারা চালু রয়েছে, সেখানে বাংলা বিভাগে তা অনুপস্থিত। আমাদের যুক্তি হচ্ছে যে, বাংলা বিভাগেও যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুটি স্বতন্ত্র ধারা অন্তত এমএ পর্যায়ে চালু থাকত, তাহলে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিধি যেমন বেড়ে যেত, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পেত। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের সাথে বাংলা ভাষার পঠন ও গবেষণা বিষয়ক আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণেও তারা পারঙ্গমতা দেখাতে সমর্থ হতো।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে বাংলা বিভাগ ছাড়াও ভাষাবিজ্ঞান, সংস্কৃত, ইংরেজি, ইসলামিক স্টাডিজ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা এবং ইতিহাস বিভাগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক বা একাধিক কোর্স পড়ানো হয়। ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ ব্যতীত বাকি তিনটি বিভাগের বিষয়ের সঙ্গে যেহেতু ভাষা ও সাহিত্যের মিথস্ক্রিয়ার রূপটি উন্মোচন করতে হয়, সেহেতু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠদানের এক ধরনের যৌক্তিকতা এই তিনটি বিভাগে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভাষার প্রায়োগিক রূপ যেহেতু সাহিত্য, তাই ভাষার বাস্তবিক অবস্থার এক একটি ধারার স্বরূপকে অনুধাবনের জন্য ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্য পাঠ করে।[২] অন্যদিকে, সংস্কৃত বিভাগে চালুকৃত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক কোর্সের[৩] উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, এই কোর্স পাঠের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভালোবাসাবোধ সৃষ্টি হবে। সে কারণে সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষা যেমন পাঠ করতে হয়, তেমনি নির্বাচিত বাংলা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধও শিখতে-পড়তে হয়। পাশাপাশি এ কথাটিও স্মরণযোগ্য, বাংলা ও সংস্কৃতের যে শাশ্বত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার স্বরূপ অবহিত হওয়ার কারণ থেকেও সংস্কৃত বিভাগে বাংলা কোর্স চালুর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। কিন্তু বাংলা বিভাগে সংস্কৃতের কোনো কোর্স চালু নেই। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো এ রকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যে, দেশের প্রধান ভাষার সাহিত্য বিভাগে শিক্ষার্থীরা মাইনর কোর্স হিসেবে বিভিন্ন ক্লাসিক ভাষা যথা— গ্রিক, লাতিন, ইড্ডিশ, হিব্রু ইত্যাদি সানন্দে পাঠ করে থাকে।

ইংরেজি বিভাগে যেহেতু ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের একটি আলাদা ধারা রয়েছে, সেহেতু বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান ও ইংরেজি সাহিত্যের সাথে এর তুলনামূলক মিথস্ক্রিয়া তৈরির লক্ষ্যেই Introduction to Bangla Literature শীর্ষক বাংলা সাহিত্যের একটি কোর্স পড়ানো হয়।[৪] ইতিহাস বিভাগে সাহিত্যের কোর্স পাঠদানের কারণ হচ্ছে, সাহিত্যের

বিভিন্ন রূপ তথা ভাষা ও ভাষার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, কবিতা বিশেষ করে মধ্যযুগের কবিতা ও আখ্যানকাব্যে, গদ্যের বিকাশধারা ও প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্যে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান লুকিয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের এসব রূপের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে ইতিহাসের জ্ঞান আরও পরিপক্ব হয়। মূলত এই বিবেচনাবোধ থেকেই ইতিহাস বিভাগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি কোর্স আবশ্যক করা হয়েছে।[৫] এই অভিন্ন কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগেও বাংলা সাহিত্যের একটি কোর্সের পাঠদান আবশ্যক হলেও, তাদের কারিকুলামে তা অনুপস্থিত। এর কারণ হিসেবে এই বিভাগের শিক্ষকেরা ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন যে, যেহেতু শিক্ষার্থীদের বিভাগের মূলস্রোতের বাইরে ইংরেজি ভাষার একটি কোর্স পড়তে হয়, সেহেতু কোর্স সংখ্যার অতি-ভারের কারণে বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কোন কোর্স তারা চালু রাখেননি। ইতিহাস বিভাগের ভাবনা ও চিন্তার সাথে তাঁদের এই যুক্তিকে তুলনা করলে বড় অদ্ভুতই মনে হয়। সবশেষে, ইসলামিক স্টাডিজ এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ তাদের পাঠক্রমে ১০০ নম্বরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোর্স চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক জাতি-রাষ্ট্রের প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যেমন প্রদর্শন করেছে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর যে বাংলা ভাষায় প্রায়োগিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তার প্রতি তাঁরা সহমত দেখিয়েছেন।[৬]

কলা অনুষদ ছাড়াও একাডেমিক বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে। যেহেতু এই ইনস্টিটিউটে 'ভাষা শিক্ষা' নামে আলাদা একটি বিভাগ রয়েছে, সেহেতু এখানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় ক্ষেত্রেই এ ধরনের কোর্স পাঠদান করানো হয়। এই ইনস্টিটিউটের ভাষা শিক্ষা বিভাগের এক শিক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ প্রসঙ্গে জানা গেছে যে, বাংলা ভাষা কোর্স প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা যাতে করে বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতার ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা লাভ করতে পারে যা তাদের বাস্তবজীবনের শিক্ষকতা পেশাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা প্রদর্শনে সহায়তা করবে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বিদেশিদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার একটি ব্যবস্থা বর্তমান। এই কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে একটি অনুভূতি থেকে যে, বিদেশ থেকে যেসব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ বা এর অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তারা যাতে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালানোর মতো বাংলা শিখতে পারে। ফলে এই কোর্সে মূলত বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিদেশি ভাষা হিসেবে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তারা যাতে বাংলা ভাষার ৪টি দক্ষতাই অর্জন করে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়। সে বিবেচনায় এখানে একজন বিদেশি শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় উচ্চতর ডিপ্লোমা পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিদেশি

ভাষা হিসেবে বাংলা শিক্ষাদানের কোনো উৎকৃষ্ট পদ্ধতি এই ইনস্টিটিউট এখনও প্রবর্তন করতে পারেনি। উল্লেখ্য, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজিসহ সংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহের জন্য এধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান যাতে করে ভিন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীরা গমনকারী দেশের ভাষা সহজেই কম সময়ে শিখতে পারে এবং তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

বিষয়-বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্যের দিক থেকে দেখলে, সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো অনেকটাই কলা অনুষদের বিষয়গুলোর মতো, অর্থাৎ বর্ণনাধর্মী। ফলে ওই সব বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য ভাষাগত দক্ষতাও জরুরি। কিন্তু এ অনুষদে ভাষাগত দক্ষতা মানে হচ্ছে, শুধু ইংরেজিতে পারদর্শিতা লাভ। বাংলার প্রবেশাধিকার অনেকটাই দূরাগত, যদিও সামাজিক বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিভাগের কোর্সসমূহে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, গণ-মাধ্যম, জনসংখ্যা ও তাদের সাংস্কৃতিক উপাদানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালানো হয়ে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগসমূহের অধিকাংশ শিক্ষকের মতে, বাংলা নয়, বরং ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন অনেকটাই অপরিহার্য। সে কারণে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সিংহভাগ বিভাগের পাঠক্রমে বাংলার অস্তিত্ব নেই। শুধু ব্যতিক্রম হিসেবে এ অনুষদের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগে ভাষা-কোর্স রূপে ইংরেজির পাশাপাশি যথাক্রমে ১০০ নম্বর ও ৫০ নম্বরের বাংলা পড়ানো হয়।[৭] সাংবাদিকতা বিভাগে বাংলা পাঠদানের যৌক্তিকতা হচ্ছে, যেহেতু এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষে দেশীয় প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চাকুরি প্রত্যাশী, সেহেতু বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করাটা তাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাংলাভাষীদের ভাষাগত বৈকল্য নিয়ে কাজ করতে হয় বলে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের অন্তর্নিহিত রূপটি জানা দরকার।

একাডেমিক বিষয় অর্থাৎ ভাষা-কোর্স হিসেবে বাংলার প্রবেশাধিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদে নেই বললেই চলে। মূলত আন্তর্জাতিকতাবোধের এক অহমিকা থেকেই এ দুটি অনুষদের শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের বাংলা চর্চায় উৎসাহিত করেন না। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান অনুষদের একদা জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক সত্যেন বোস বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে প্রবন্ধাদি রচনা করে গেছেন।

সবশেষে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাতৃভাষা পঠন-পাঠন সম্পর্কে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো। যেকোনো ভাষা জানা মানে হচ্ছে ঐ ভাষার চারটি মৌলিক দক্ষতা, যথা- শ্রবণ, কথন, পঠন ও লিখন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। তাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে (pedagogy) বিদ্যালয় পর্যায়ে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চারটি মৌলিক দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় (আরিফ ১৯৯৮)। বিশেষ করে, কোন বিদেশিকে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে গেলে বিদ্যালয় পর্যায়ে অতি অবশ্যই এই চারটি

দক্ষতা আয়ত্ত করতে হয়। তা না হলে শিক্ষার্থী ওই ভাষাটি পরিপূর্ণভাবে শিখেছে বলে ধরে নেওয়া হয় না। কিন্তু ভাষাটি যদি হয় তার মাতৃভাষা, সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে এর শিক্ষণ পদ্ধতিটি একটু ভিন্ন হবে নিশ্চয়ই। কেননা বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে কথন ও শ্রবণ দক্ষতাকে যত না মূল্যায়ন করা হয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় পঠন ও লিখন দক্ষতা অর্জনকে। এর প্রতিফলন লক্ষণীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্বইয়ের দশকের শেষ প্রান্তে কলা অনুষদে আবশ্যক হিসেবে চালু বাংলা ভাষা কোর্সের পাঠক্রমেও।[৮] তখন এই কোর্স প্রবর্তনের যুক্তি ছিল এরকম যে, শিক্ষার্থীদের স্কুল পর্যায়ে মাতৃভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা শিখে আসার কথা থাকলেও যেহেতু এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা যথেষ্ট নয়, সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও ভাষাগত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তাত্ত্বিক দিক উপলব্ধিসহ বিভাগের কোর্সসমূহ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়া এ কোর্স প্রবর্তনের সময় শিক্ষার্থীদের বাংলা লিখনরীতির উন্নয়নের দিকটিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। ফলে এক ধরনের অপরিহার্য বুনিয়াদি কোর্স হিসেবে তাদের জন্য কলা অনুষদে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিও চালু করা হয়। কলা অনুষদের ডিনের তত্ত্বাবধানে চালুকৃত এ দুটি কোর্সে ভাষার প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের চারটি দক্ষতায় পারদর্শী হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হতো। এতে করে কলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জিত হলেও কয়েক বছর পর কোর্স দুটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কলা অনুষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলা ও ইংরেজির পাঠদান উঠে গেলেও একুশ শতকের শুরুতে এই অনুষদের প্রায় প্রতিটি বিভাগই তাদের পাঠক্রমে ভাষা-কোর্স হিসেবে আবার ইংরেজির পাঠদানকে আবশ্যক করেছে, কিন্তু বাংলার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাহলে কি ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা শেখার কারণে তারা এ ভাষা বিষয়ে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করেছে? বিষয়টি কিন্তু তা নয়। মূল ধারা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার যে মাত্রা, তা দেখে বোঝা যায় যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা এখনও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। এছাড়া শিক্ষার মূল স্রোত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত ইংরেজি দক্ষতাও তথৈবচ। ফলে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা নাজুক অবস্থায় থেকে গেলেও কলা অনুষদের প্রত্যেক বিভাগে ভাষা-কোর্স হিসেবে শুধু ইংরেজি আবার জোরে শোরে চালু করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলা নেই কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কলা অনুষদের অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষক বলেন যে, বিভাগের কোর্স সংখ্যার অতি-ভার হচ্ছে এর প্রধান কারণ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিভাগেরই মূল বিষয়ের কোর্সের সংখ্যা এত বেশি যে ভাষা-কোর্স হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তনের পর বাংলা চালুর আর কোনো সুযোগ থাকে না। তবে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা বাংলা চালুর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কোর্সের ভার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা তারা পেরে ওঠেন না বলে মত

দেন। এতে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠল, সেটি হচ্ছে ভাষা-কোর্সের প্রাধিকার। এই প্রাধিকারে বাংলা কখনই ইংরেজির সাথে পেরে ওঠেনি। এক্ষেত্রে বাঙালি যত না দেশপ্রেমিক, তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী। এটিই হচ্ছে জাতি হিসেবে বাঙালির সবচেয়ে বড় দ্বৈততা। কেননা নিজের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাঙালি একটি একুশে ফেব্রুয়ারির জন্ম দিলেও শিক্ষার ভাষানীতিতে তারা বড়ই প্রয়োগবাদী ও টনটনে বাস্তবজ্ঞানের অধিকারী।

২.২ *শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার*

একটি ভাষার প্রায়োগিক সফলতা তখনই অর্জিত হয়, যখন এটি একাডেমিক বিষয় রূপে পাঠদানের পাশাপাশি উচ্চতর পর্যায়ে বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অনুসৃত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষা এখনও পুরোপুরি কেজো বা প্রায়োগিক ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা, এ ভাষাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সীমিত আকারে চর্চিত হলেও সিংহভাগ বিভাগে এটি এখনও প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ব্যবসায় অনুষদ ও বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি অনুষদে এখনও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পায়নি। এ বিষয়টিকে নিচের দুই পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

ক. শ্রেণিকক্ষে কথ্য মাধ্যম রূপে বাংলা

খ. পরীক্ষার লেখ্য মাধ্যম রূপে বাংলা

একমাত্র বাংলা বিভাগেই বিশুদ্ধ অর্থে কথ্য এবং লেখ্য মাধ্যম রূপে বাংলা ব্যবহৃত হয়। বিষয়টি যৌক্তিকও বটে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার অন্তরালে নিহিত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা এবং সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রূপ ও রসকে উন্মোচিত করা যাতে করে এ ভাষার সম্ভাবনাকে সকলেই সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। তবে কলা অনুষদে ইংরেজি ব্যতিরেকে অন্য বিভাগুলোতে শ্রেণিকক্ষে বাংলা ব্যবহৃত হলেও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার উত্তরপত্রে বাংলা বা ইংরেজি যে কোন একটিতে উত্তর দিতে পারে, যদিও সম্প্রতি কোন কোন বিভাগ পরীক্ষার লিখন মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে[৯]।

কলা অনুষদ ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের বিভাগসমূহে শ্রেণিকক্ষ ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে দ্বৈত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই বাংলায় ভাব-বিনিময়ে স্বচ্ছন্দ হলেও উত্তরপত্রে বাংলার প্রবেশাধিকার নেই। এই অবস্থাটির তীব্রতা সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে বিজ্ঞান অনুষদে অধিক। এ পরিস্থিতিকে মাতৃভাষা চালুর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাঙালি হিসেবে বাংলার শ্রবণ ও কথন দক্ষতা আমাদের সহজাত। তাই শ্রেণিকক্ষে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে

বাংলার ব্যবহারের মাধ্যমে এ ভাষার সর্ব-পারঙ্গমতার প্রমাণ মেলে না, যদি না এটি বিভিন্ন বিষয়ের লেখ্যরূপ হিসেবে যোগ্য হয়ে ওঠে।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলা ভাষা বিভিন্ন বিষয়ের লেখ্য রূপ প্রকাশের উপযোগী মাধ্যম হিসেবে গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে ভাষা হিসেবে এর অবয়বগত সীমাবদ্ধতা যত না দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যবাহী ব্যক্তিমানুষের ঔপনিবেশিক মানসিকতা। 'ব্যক্তিমানুষ' বলতে এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, নীতি-নির্ধারক সবাইকে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি প্রকৃত আবেগ, ভালোবাসা ও দরদ থাকলে নিজের ভাষার সীমাবদ্ধতাকে দূর করার জন্য নানারকম অবয়ব পরিকল্পনা অনায়াসেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর সরকারি প্রণোদনা এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে বাংলা বিভাগ ব্যতীত কলা অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষার মাধ্যম ছিল মূলত ইংরেজি। তবে এই ধারাটির বিপরীতে বাংলার পক্ষে হাওয়া বইতে শুরু হয়ে পঞ্চাশের দশকে, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধার সময় থেকেই। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে এক নতুন উদ্দীপনা স্ফুরিত হয়, যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিভাগই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার প্রেরণা লাভ করে। বিশেষ করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বশবর্তী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে তখন শ্রেণিকক্ষের ভাষারূপ যেমন নির্ভেজাল বাংলা ছিল, তেমনিভাবে উত্তরপত্রের লেখ্যরূপ হিসেবে তখন দ্বি-ভাষারীতি চালু ছিল। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী তখন ইংরেজি বা বাংলা যেকোনো একটি রীতিতে পরীক্ষার খাতায় উত্তর প্রদান করতে পারত। তাতে করে, শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। কেননা, উত্তরপত্রের ভাষারীতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দক্রমের একটা স্বাধীনতা ছিল, যা একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক মানবাধিকারের অংশ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার এই অগ্রগমন স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক বছর বর্তমান থাকলেও বিশ্বায়নের প্রভাবে নব্বইয়ের দশকে এসে তা অনেকটাই স্ড়িমিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, বাংলা বিভাগ ব্যতীত কলা অনুষদের অন্যান্য বিভাগ, আইন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলো তাদের শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের লেখার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে প্রত্যাবর্তন করে। নিচের আলোচনায় তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২.৩ বাংলা ভাষা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন ও এ সংক্রান্ত কোর্স পাঠদান করানো হয় ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে। অতীতে বাংলা বিভাগের অধীনে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে অতিরিক্ত কোর্স হ্রাস করার কারণে বাংলা বিভাগে বাংলা ভাষা বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে।[১০] তাই এ ধরনের সুযোগ এখন শুধু ভাষাবিজ্ঞান বিভাগেই বর্তমান রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর পর্যায়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চালুকৃত ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক কোর্সে বাংলা ভাষার উপাদানসমূহের সাংগঠনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কৌশলসমূহও আয়ত্ত করে নিতে পারে।

৩. বিশ্বায়নের প্রভাব : ইংরেজির প্রত্যাবর্তন

ওপরের আলোচনা থেকে উপলব্ধ হয় যে, একাডেমিক বিষয় বা শিক্ষার মাধ্যম এই উভয় অবস্থান থেকেই বাংলা ভাষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রমশ স্থানচ্যুত হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যেমন বেশি বঞ্চিত হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে এটি ভাষা কোর্স হিসেবেও বিভিন্ন বিভাগে তার আগের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের নীতি-নির্ধারকদের পাঠদানের ভাষা সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তনকে দায়ী করা যায়। আর তাঁদের এই পরিবর্তিত মনোভাবের পেছনে সাম্প্রতিক বিশ্ব-অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের যে বিস্তার ঘটেছে তাকে নিয়ামক ভাবা যেতে পারে।

বিশ্বায়ন হচ্ছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতির আপাত পরিণত এক রূপ যেখানে বিশ্ববাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন এক উন্মুক্ত বাজার তৈরি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বায়ন নামক এই অর্থব্যবস্থা ভাষার ওপর কী প্রভাব রাখছে? আমরা দিব্য চোখে দেখতে পাই, বিশ্বায়ন আপাতদৃষ্টে এক প্রতিযোগিতামুখর অর্থব্যবস্থা হলেও এর ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও রয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের প্রবক্তারা মনে করেন, পণ্য ক্রয়ের সাথে সাংস্কৃতিক ও ভাষিক অভিন্নতার একটি সম্পর্ক বিদ্যমান (Xue & Zuo 2013)। সাম্প্রতিক বাস্তবতায় আমরা দেখেছি যে, উন্নত পশ্চিমাবিশ্ব ফরমায়েশের মাধ্যমে আমাদের শ্রমিক দিয়ে আমাদের দেশেরই কল-কারখানায় পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভাষানির্ভর পণ্যই তৈরি করে নিচ্ছে। এখন ওই পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভাষাকে যদি ভোক্তাদের দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ভোক্তা সহজেই এগুলো নিজেদের পণ্য মনে করে ক্রয় করবে। আবার প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভাষা বলতে আমরা কী বুঝি? বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যদি আমরা এই দুটি সাংস্কৃতিক অভিধার অর্থ অন্বেষণ করি, তাহলে সরল উত্তর হচ্ছে, পশ্চিমা সংস্কৃতি বলতে এখানে অ্যাংলো-আমেরিকান সংস্কৃতিকেই মূলত বুঝানো হচ্ছে; কেননা বিশ্বায়নের নেতৃত্বকারী দেশগুলোর প্রথম সারিতে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন।

তাই স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বায়নের ভাষা হচ্ছে নিঃসন্দেহে ইংরেজি। ফলে বিশ্বায়নের ভাষা হিসেবে ইংরেজি বর্তমান বিশ্বের একাডেমিয়াতে সাম্প্রতিককালে এক দৈত্যাকৃতি রূপ নিয়েছে, যে কারণে যেকোনো উন্নয়নশীল দেশই তার বিদ্যায়তনিক ভাষা হিসেবে প্রথমেই ইংরেজিকে বিবেচনা করে, যদি না ঐতিহাসিক বা ঔপনিবেশিক কারণে দেশটি ফরাসি বা স্পেনীয় কলোনিভুক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনি হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে দ্বিতীয় বা বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি পড়ানোর ঐতিহ্য থাকলেও নতুন করে এর রাজসিক প্রত্যাবর্তন ঘটেছে।

বাংলাদেশের একাডেমিয়াতে ইংরেজির এই প্রত্যাবর্তনকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, ঔপনিবেশিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি দুশো বছর ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রাজত্ব করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক ভাষার প্রসঙ্গে প্রথমেই এদেশবাসীর মনোচেতনায় জ্বল জ্বল করে বিরাজমান ইংরেজির কথাই মনে আসে। এর পাশাপাশি আরেকটি কারণও এক্ষেত্রে বেশ প্রকট, সেটি হচ্ছে বৈশ্বিক একাডেমিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির বিশালতা ও বৈভব। এ প্রসঙ্গে আল্টবাক (Altbach 2007) আমাদের অবহিত করছেন যে, বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের আগেও বিশ্ব একাডেমির ভাষা হিসেবে ইংরেজি এত প্রভাবশালী ছিল না। কেননা, তাঁর মতে, বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ব পর্যন্ত বৈশ্বিক একাডেমির ভাষা পরিস্থিতি একটু ভিন্নরূপ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ত্রিশের দশক পর্যন্ত জার্মান ভাষা জ্ঞানচর্চার বৈজ্ঞানিক ভাষা রূপে ব্যাপক আন্তর্জাতিকতা অর্জন করেছিল। একই সাথে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ইউরোপের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহ তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান চর্চা ও একাডেমির ভাষা হিসেবে জার্মান, ফরাসি, স্পেনীয়, সুইডিশ, রুশ ইত্যাদি ব্যবহার করেছে, যদিও এই ধারাটি এখনও এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রবল ধাক্কায় তাদের অবস্থান এখন অনেকটাই টলমলে। অন্যদিকে, ইউরোপের এসব জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের বাইরের দেশসমূহের একাডেমিয়াতে পঞ্চাশের দশকের পর পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে, সেখানে ইংরেজি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান চর্চার ভাষা রূপে এত বেশি চর্চিত হওয়া শুরু করে যে, কয়েক দশক পরে অর্থাৎ একুশ শতকের শুরুতে আকারে ও প্রকারে তা এক দৈত্যের চেহারা নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজি বর্তমান বিশ্বে একচ্ছত্র ও অপ্রতিরোধ্য একাডেমিক ভাষা হিসেবে রূপ লাভ করার কারণে এর আকৃতি ও প্রকৃতি এত বিশাল রূপ ধারণ করেছে যে, এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো দ্বিতীয় ভাষা পৃথিবীতে বর্তমান নেই। একাডেমির ভাষা হিসেবে ইংরেজির বিশালতার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে গিয়ে আল্টবাক (Altbach 2007: 3608-3609) যে তথ্য প্রদান করেছেন তা এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

১. ইংরেজি হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় ৭০টিরও বেশি দেশের সরকার স্বীকৃত দাপ্তরিক ভাষা। মূলত অষ্টাদশ শতক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইংল্যান্ড কর্তৃক কলোনি প্রতিষ্ঠা ইংরেজি ভাষার এ মর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

২. বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত শিক্ষার্থী ইংরেজিতে পড়াশুনা করছে, চীন দেশে তার চেয়েও বেশি সংখ্যক ছাত্র ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়নরত।

৩. ইংরেজি অনুসারী একাডেমিক শিক্ষা-পদ্ধতি সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান বিতরণ করে থাকে।

৪. পৃথিবীতে বিভিন্ন বিষয়ে যত কনফারেন্স, সেমিনার, সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার সিংহভাগই সম্পন্ন হয় ইংরেজিতে।

৫. সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন যত একাডেমিক গবেষণা জার্নাল প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশই প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায়।

৬. বৃহত্তম ইংরেজি-উচ্চশিক্ষার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকই অবস্থিত।

আর এসব খ্যতিমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি তাঁদের সারাজীবন এক ধরনের সহানুভূতি থেকে যায়। সে কারণে নিজ দেশেও তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই অবস্থা বিরাজমান। ঐতিহ্যগতভাবে প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনি হওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংরেজি-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই তাঁদের পছন্দের শীর্ষে স্থান দিয়ে থাকে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপন শেষে দেশে ফেরার পর ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা তৎপরতা দেখায়। সেই সাথে বিশ্বায়ন পর্ব তাঁদের এই তৎপরতায় নতুন করে ঘি ঢেলে দিয়েছে।

৩.১ *একাডেমিক ভাষা সরণ*

বিশ্বায়ন ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের নীতি-নির্ধারকেরা মনে করেন, শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তাঁদের মতে, শিক্ষার্থীদেরও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ করা তাদের মৌলিক অধিকারের অংশ। সে কারণে বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের অনুসৃত রীতি অনুসরণ করে কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগসমূহ সাম্প্রতিককালে তাঁদের শ্রেণিকক্ষ ও উত্তরপত্র প্রণয়নের ভাষা রূপে বাংলা থেকে ইংরেজিতে বদল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি তা কার্যকরও করেছে। এ বিষয়টিকে, অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নতুন করে একাডেমিক ভাষা হিসেবে বাংলা থেকে ইংরেজিতে প্রত্যাবর্তনকে, আমরা একাডেমিক ভাষা সরণ (academic language shift) বলতে পারি।

একাডেমিক ভাষা সরণ সমাজভাষাবিজ্ঞানে অনুসৃত ভাষা সরণ (language shift)-এরই একটি রূপ। তবে সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষা সরণ ধারণাটি মূলত কোন ভাষিকগোষ্ঠীর নতুন ভাষাকে বরণ করে নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত (Weinreich

1964)। ভাষা সরণ বিষয়ে যেসব সমাজভাষাবিজ্ঞানী (Brown 2008; Habtoor 2012; Weinreich 1964) কাজ করেছেন, তাঁরা এক্ষেত্রে ভাষা সরণের জন্য নিচের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. যারা অন্য দেশে অভিবাসী হিসেবে স্থায়ী হয়েছেন এবং সে কারণে তাঁদের নিজের ভাষাচর্চার বিষয়টি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

খ. বিপন্নভাষী যাদের ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে রয়েছে।

কিন্তু বিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কৃত একাডেমিক ভাষা সরণ অর্থাৎ একাডেমির ভাষা হিসেবে বাংলা থেকে ইংরেজির স্থানান্তরকে ওপরের দুটি ক্লাসিক্যাল ভাষা সরণের সঙ্গে মেলানো যায় না। বরং এক্ষেত্রে ফিসম্যানের (Fishman 2013, 1966) ভাষা সরণ বিষয়ক একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ফিসম্যানের মতে, ভাষা সরণের ক্ষেত্রে ভাষাচর্চাকারীর একটি দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণও কাজ করে। তাঁর এই তাত্ত্বিক ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের নীতি-নির্ধারকরা নব্বই দশকের শেষপাদে এসে বিশ্বায়নের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রণোদনায় এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা লালনের কারণে বাংলা ভাষাকে বিশ্বায়নের ভাষা হিসেবে উপযোগী করার পরিবর্তে ইংরেজিকে নতুন করে বরণ করে নিয়েছেন। তবে তাঁদের এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা লালনের অন্তরালে অর্থনৈতিক কারণও কাজ করেছে। কেননা হম্‌জের মতে (Holmes 2013), ভাষা সরণের দুটি প্রধান কারণের অন্যতম হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ। সে বিবেচনার সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকদের যুক্তি এই যে, এতে করে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক ভাষা ইংরেজিতে দক্ষ হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের যোগ্যতা অনেক বেড়ে যাবে। এছাড়া তাঁরা এই মতও পোষণ করেন যে, কষ্ট করে বাংলাকে একাডেমির লিখিত ভাষা হিসেবে তৈরির চেয়ে ঐতিহাসিক ইংরেজির শরণ নেওয়া অনেক সহজ। আজকের বৈশ্বিক সমাজবাস্তবতায় এই যুক্তির বিপরীতে প্রতিযুক্তি উত্থাপন করা কঠিন হলেও এটি সত্য যে, হয়ত বৈশ্বিক বাজার ও একাডেমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার বাড়ছে, কিন্তু জ্ঞানার্জনে সৃজনশীল মন আর তাদের কাছে ভিড়ে না। ফলে পঠন-পাঠনের সাথে সাথে নতুন জ্ঞান সৃজনের চেয়ে বাজার দরে নিজেকে যোগ্য নির্বাহী হিসেবে গড়ে তোলার দিকেই তাদের এখন অধিকতর মনোযোগ। এর পরিণতিতে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তাঁদের মনে প্রকারান্তরে নিজের ভাষার একাডেমিক রূপটির আকস্মিক মৃত্যু ঘটে (Fillmore 1991)।

সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক একাডেমিক ভাষা সরণের ফলে বাংলা ভাষা নিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল, তাতে আবার নতুন করে অর্গল দেওয়া হলো। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নব্বইয়ের দশকের শেষপাদে কলা

অনুষদে চালুকৃত বাংলা ও ইংরেজি কোর্স ১০ বছর পর অনিবার্য কারণে বন্ধ হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে প্রতিটি বিভাগে বুনিয়াদি কোর্স হিসেবে পুনরায় ইংরেজি ভাষা-কোর্স চালু হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা আর আলোর মুখ দেখেনি। এভাবেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কলা অনুষদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে বাংলার পরিবর্তে নতুন করে ইংরেজি ফিরে এসেছে। বিশেষ করে, আইন, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় অনুষদে এক সময় পরীক্ষার উত্তর লেখার ক্ষেত্রে দ্বি-ভাষারীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই প্রশ্ন লেখা থাকত এবং পরীক্ষার্থী ইচ্ছে করলে যেকোনো একটি ভাষায় তার উত্তর প্রদান করতে পারত। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে এই দ্বি-রীতি বাদ দিয়ে ইংরেজিকে আবশ্যিক করা হয়েছে। ফলে একজন শিক্ষার্থীকে এখন শুধু ইংরেজিতেই উত্তর প্রদান করতে হয়।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজির কাছে বাংলার এই যে অসহায় আত্মসমর্পণ তা কিন্তু নতুন নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সুবর্ণ সময়েও এধরনের একটি অবস্থা বর্তমান ছিল যা আমরা ভট্টাচার্যের (১৯৭৪) বিবরণ থেকে লাভ করতে পারি। শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্পর্কে তিনি আমাদের বলছেন-

> ...ইংরেজি ভাষা বিদেশী ভাষা হইলেও ইহাকে আমরা যেভাবে আমদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তায় প্রথম হইতেই প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি, বাংলা ভাষা মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে আমরা সেভাবে ব্যবহার করি নাই। সেদিন বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে পঠন-পাঠনের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রশাসনিক কর্ম পরিচালনা এবং কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন রূপে পর্যন্ত গ্রহণ করি নাই। এমন কি, আজ পর্যন্ত তাহা উচ্চতর শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর কথা বাদ দিলেও যে ইংরেজি ভাষা আমাদের জীবনেরও সর্বস্তরে তাহার অধিকার আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখিয়া চলিতেছে, তাহার পার্শ্বে বাংলা ভাষা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সুযোগমাত্র লাভ করিয়া বাঙ্গালী জীবনের ব্যবহারিক সকল ক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া ইংরেজি ভাষার সমান মর্যাদা ও মূল্য লাভ করিতে পারে নাই। (ভট্টাচার্য ১৯৭৪ : ৫৯)

পাঠক, লক্ষ করুন, উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ বছর আগে বর্ণিত শ্রী ভট্টাচার্যের উপরিউক্ত অভিমতের সঙ্গে আজকের দিনের হতাশার কোনো তফাৎ আছে? আমাদের বিবেচনায়, নেই। তাহলে অঙ্কের হিসেবে ফলাফল দাঁড়াচ্ছে যে, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ওপর এই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলার স্থানটি এখন অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছে। কারণ একাডেমিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার সম্ভাবনাটি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দপ করে জ্বলে উঠলেও, তা এখন একেবারেই নিভে গেছে বলে আমরা মনে করছি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার এই নির্বাসন শুধু যে ভাষা হিসেবে বাংলার অসফলতা তা-ই নয়, বরং এটি আমাদের একটি রাষ্ট্রীয়

ব্যর্থতাও বটে।

৩.২ একাডেমিক ভাষা সরণ ও ঊন-সৃজনশীলতা

এই প্রবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপিত সৃজনশীলতার প্রসঙ্গটি আবার এখানে উত্থাপিত হতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এই যে ইংরেজি ভাষার প্রত্যাবর্তন, তাতে করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধার বিকাশ কি সাধিত হচ্ছে? আমাদের সরল উত্তর, হচ্ছে না। কারণ আমরা এই শিক্ষার্থীদের সেবাধর্মী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার দিকেই আমাদের বেশি মনোযোগ দিয়েছি; কিন্তু তাদের ভেতরের সৃজন ক্ষমতাকে উস্কে দেওয়ার জন্য আমরা তৎপর নই। ফলে ইংরেজিতে পড়ে ও শিখে আমাদের শিক্ষার্থীরা সারা বিশ্বের বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এনজিওতে সেবা প্রদানের জন্যই অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে। কিন্তু মাতৃভাষায় বিদ্যা চর্চার মাধ্যমে নিজের ভেতরকার সৃজনধর্মকে জাগ্রত করে নতুন জ্ঞান তৈরি ও বিতরণে তাদের কোন প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ও দ্বিতীয় ভাষা আয়ত্তকরণজনিত বিপুল প্রচেষ্টার কারণে তাদের সৃজনশীল বিকাশের ক্ষেত্রে দারুণ ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমেই মানুষের সৃজনশীলতার সবচেয়ে বেশি বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও কোন আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছা নেই বলেই মনে হয়।

৩.৩ বাংলা প্রচার ও প্রসারের সঙ্কোচন ধারা

ফলিত ভাষাবিজ্ঞানীরা বরাবরই বলে থাকেন যে, শিক্ষাক্ষেত্র, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি ভাষার সর্বভাব প্রকাশ ও বিকাশের ল্যাবরেটরি। কারণ, ভাষাটি যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে, তখনই তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে বলে ধরে নেওয়া হয়। সে বিবেচনায় বর্তমানে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে সচেতনভাবে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ভাষা সরণ হয়েছে। এর ফল হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা যে শুধু সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সমৃদ্ধ নয়, বরং এ ভাষার মাধ্যমে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিচিত্র ভাবনাকে প্রকাশ করা যায়, সে প্রতীতি থেকে সম্প্রতি অনেকেই সরে এসেছে। ফলে বাংলাকে এ অপবাদ আরও বহুদিন বয়ে বেড়াতে হবে যে, এটি সাহিত্যের ভাষা হিসেবে যত শক্তিশালী, একাডেমির ভাষা হিসেবে ততই দুর্বল। পাশাপাশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাষা-সরণ রীতিকে অনুসরণ করে দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বাংলা খেদানোর পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে শুরু করেছে।

৪. পর্যালোচনা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্প্রতিককালের এই যে একাডেমিক ভাষা সরণ বা বাংলা থেকে ইংরেজিতে প্রত্যাবর্তন তার সুদূরপ্রসারী ফল বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়টি আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যায়। তা হচ্ছে, বাঙালির দেশপ্রেম তথা স্বাজাত্যবোধে অহমিকায় কতটুকু প্রাবল্য রয়েছে, তা মূল্যায়ন করা। বাংলাদেশের একাডেমিক ভাষা-পরিস্থিতির বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এক্ষেত্রে মিশ্র অবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম-প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের ভাষাপ্রেম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, যা আমরা বায়ান্নোর ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিলাম। এক কথায় বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই একমাত্র ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের ভাষাপ্রেম নিঃসন্দেহে অতি-প্রবল। কিন্তু আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা তথা বাংলার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের এই আবেগিক ভাষাপ্রেম প্রয়োজনের কাছে নতি স্বীকার করে। তাই বলা যায় যে, ভাষা-ভাবনা বিষয়ে বাঙালির মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কেননা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালির নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হলেও একাডেমির ভাষা হিসেবে অনেকে তার মাতৃভাষা বাংলাকে এখনও উপযোগী মনে করছে না। আমরা এখন তার প্রকৃত কারণগুলো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

কেন একাডেমির ভাষা হিসেবে বাংলা এখনও ব্যবহার্য হয়ে উঠছে না? এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন যে,

১. বিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসা ও প্রযুক্তির ভাষা হিসেবে বাংলা এখনও ততটা সক্ষম নয়।
২. এ ভাষাটিতে উল্লেখিত বিষয় প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ-ভাণ্ডার নেই।
৩. উল্লেখিত বিষয়ে বাংলায় কোন প্রতিনিধিত্বমূলক বই, প্রবন্ধ এখনও রচিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উল্লেখিত প্রথম ও তৃতীয় যুক্তিকে অনেকটা সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার বয়স একশো বছর ধরে বলা যায় যে, এই একশো বছরে বাংলায় সাহিত্যের নানামাত্রিকতাকে কেন্দ্র করে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার সিকিভাগও অন্য সমস্ত একাডেমিক বিষয়ে রচিত হয়নি। কেন হয়নি তার কারণটিও অজানা নয়। সেটি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক ও গবেষকদের এক্ষেত্রে রয়েছে প্রচণ্ড উন্নাসিক মানসিকতা। তাঁরা নিজেরাই তাঁদের অধীত বিষয়ে বাংলায় গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী নন। কারণ, তাঁদের ভাষ্যমতে, কষ্ট করে গবেষণার বিষয় বাংলায় প্রকাশ করলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাঠককুলের কাছে তা পৌঁছাবে না। তাছাড়া কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের মাধ্যমে কেউ বাংলায় তাঁর গবেষণাকর্ম প্রকাশ বা গ্রন্থাদি রচনা করলে বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার কোনো পক্ষ থেকেই যথাযথ স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এ সমস্ত কারণে অধ্যাপকেরা বাংলায় গবেষণা

সম্পাদন অথবা প্রবন্ধ বা বই প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করেন। আর গবেষক-শিক্ষকদের এ অনীহার কারণেই বাংলা ভাষা এখনও সর্বভাব প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠেনি।

ওপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় যুক্তিটি অনেকটাই অসত্য। কারণ বিগত শতাধিক বছর আগে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৩০০/১৮৯৩) সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম পরিভাষা তৈরির কাজ শুরু করেন বলে জানা যায়। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান আমলে ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলা একাডেমির বিভিন্ন উদ্যোগও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তবে এসব পরিভাষা দেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকরা বলেন যে, এ পরিভাষাগুলো প্রচলিত ইংরেজি শব্দের চেয়ে কঠিন, এবং ঠিক ভাবের প্রকাশ সহায়ক নয়। এক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর যুক্তি হচ্ছে, বিষয়টি পুরোটই মানসিক। তাই সৃষ্ট পরিভাষাগুলোকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে ব্যবহার শুরু করলে কিছুদিনের মধ্যেই তা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে উপযোগী হয়ে উঠবে। কারণ ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব বলে যে, একটি শব্দের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই, যদি না আমরা এতে অর্থ আরোপ করি। অর্থাৎ যেকোনো পরিভাষাই হচ্ছে একটি ভাব বা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহারের উপযোগী। এক্ষেত্রে করণীয় কাজ হচ্ছে, সৃষ্ট পরিভাষাটিকে মানসিকভাবে গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবহার করা। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃষ্ট পরিভাষাগুলো নির্ধারণ বা নির্বাচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়ভাবে বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠনের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নীতি-নির্ধারকদের বিবেচনায় উল্লেখিত কারণসমূহ বর্তমান থাকার জন্যে এবং একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মেলানোর তাগিদে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ভাষা সরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, বিশ্ববিদালয়ের কোনো বিভাগ কেন্দ্রীয় মতামত ব্যতিরেকে এককভাবে ভাষা সরণের মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কিনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত 'অধ্যাদেশ-৭৩' ঘেঁটে এ সংক্রান্ত কোনো সংকেত বা নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী এই তেয়াত্তরের অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিভিন্ন বিভাগের 'ভাষা নির্দেশনা' কী হবে তার কোনো রকম বর্ণনা বা ব্যাখ্যা নেই। আর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকাকে এই অধ্যাদেশের অন্যতম দুর্বলতা বা ত্রুটি হিসেবে নির্দেশ করা যেতে পারে। ফলে বিভাগগুলো বিশেষ করে, শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদের ভাষিক অধিকার বিষয়ে অহরহ হস্তক্ষেপ করে, তাদের ইচ্ছেমতো ভাষানীতি নির্ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের মৌলিক মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে বিদেশি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের মতো নীতি নির্ধারণ করে থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শিক্ষার ভাষানীতি নির্ধারণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় নীতি-নির্ধারকদের দ্বারস্থ তো হয়ই না, বরং যার ওপর এই শিক্ষামাধ্যম চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই শিক্ষার্থীর মতামত নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেন না।

আপাতদৃষ্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভাষা সরণকে একটি বাংলাদেশি বাস্তবতা বলে মনে হলেও এটি একটি আন্তর্জাতিক ফেনোমেনন যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে বিশ্বায়নে। মূলত এটিকে বৈশ্বিক এককেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থামূলক বিশ্বায়নের এক ধরনের পরিণতি হিসেবে গণ্য করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বায়ন আপাত অর্থে অর্থব্যবস্থা হলেও এর একটি সাংস্কৃতিক মাত্রা আছে, যার কারণে এই বিশ্বব্যবস্থাটি ইংরেজিকে বিশ্বের আলটিমেট ভাষা গণ্য করে এর পরিপোষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। আর বিশ্বায়নের এই পরোক্ষ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আকৃষ্ট হয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাতে সাড়া প্রদান করে থাকে। এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরে বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ভাষা সরণকে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার এক অনিবার্য ফল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি আমাদের বাঙালি ব্যক্তি-মানসে ফল্গুধারার মতো ক্রিয়াশীল কলোনিয়াল মানসিকতা এই বিশ্বায়নের পক্ষে একাডেমিক ভাষা সরণে পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে।

উপরিউক্ত যুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে একাডেমিক ভাষা সরণকে একটি তৃতীয় বিশ্বের একাডেমিক বাস্তবতা রূপেও আখ্যায়িত করা চলে। অর্থাৎ বাংলাদেশসহ ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলমুক্ত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত এ ধরনের ভাষা সরণ ঘটছে। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকান রাষ্ট্র রোয়ান্ডার কথা এখানে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। রোয়ান্ডা একটি প্রাক্তন ফরাসি কলোনি হওয়ার কারণে ঐতিহ্যগতভাবে ফরাসি সে দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চর্চিত হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে ২০০৮ সালে রোয়ান্ডার জাতীয় সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (Kagwesage 2012)। অর্থাৎ রোয়ান্ডার জাতীয় সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভাষা সরণ হয় ফরাসি থেকে ইংরেজিতে। ফলে ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণিকক্ষে ইংরেজিতে পাঠদান শুরু হয়। কিন্তু কাগওয়েসাগে (Kagwesage 2012) এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, শ্রেণিকক্ষে ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজি ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কারণ অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শিক্ষকের পাঠ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে না। আর তার প্রভাব পড়ে শিক্ষকের লেকচার নোট করতে গিয়েও। এ সমস্ত কারণে ঐ দেশের শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কাগওয়েসাগের (Kagwesage 2012) মতে, কিন্তু তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়পর্বে ইংরেজির অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। কেননা, শিক্ষক ও

সাথে পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দুই ভাষারীতি তথা বাংলা ও ইংরেজিতে নির্দেশনা থাকবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা উত্তরপত্র বাংলা বা ইংরেজি যে কোন একটি রীতিতে লিখতে পারবে। আজকের পৃথিবীর বিশ্বায়িত বাস্তবতায় যদি বাংলাদেশের একাডেমিয়াতে তা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে ইংরেজির চর্চা যেমন সম্ভব হবে, তেমনি বাঙালির জাতীয়তার অহংবোধ বাংলা ভাষাও সব বিষয়ের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বিতা অর্জন করবে। আর তা নিশ্চিত হলে শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে তাদের সৃজনধর্মের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

৫. উপসংহার

প্রায়োগিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বাংলা ভাষার একটি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার। এই গবেষণাগারে এ ভাষাটি যত বেশি চর্চিত হবে, ততই এর ভাব ও প্রকাশগত সম্ভাবনা জাগ্রত হবে, এবং এর সীমাবদ্ধতার নানাদিকও উন্মোচিত হবে। ফলে এসব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার বিভিন্ন কৌশলও পর্যায়ক্রমে উদ্ভাবিত হবে যাতে করে বাংলা ভাষাটি পরিণতিতে সকল বিষয় ও ডিসিপ্লিন প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে।

টীকা

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম এবং পঠিতব্য বিষয় হিসেবে বাংলার প্রচলনের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তুষার কান্তি মহাপাত্র (১৯৯৫) তা সবিস্তারে লিখেছেন। তাঁর মতে, ৩রা জানুয়ারি ১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সেনেট অধিবেশনে পাশকৃত পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালায় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ইংরেজির পাশাপাশি ১১টি ভাষার মধ্যে বাংলা একটি ঐচ্ছিক বিষয়ে পঠনের জন্য নির্বাচিত হয়, যদিও এ নীতিমালার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৩ বছর। আবার ১৮৫৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সেনেট অধিবেশনেও বাংলা বিষয়ে একই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হলেও বি.এ. পরীক্ষায় বাংলার পঠন-পাঠনের বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে গেল। পরবর্তীকালে ১৯০১ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত ভারতের ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে ১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন ভারতীয় ভাষাসমূহের শিক্ষা ও তার প্রসারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ইংরেজির পাশাপাশি ভারতীয় ভাষাতেও এম.এ. পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারই সূত্র ধরে ১৯০৬ সালের ৬ই মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পর আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও পরিপূর্ণ একাডেমিক বিষয় হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বেশকিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে দিয়ে ১৯০৯ সালে 'Special University Readership' বক্তৃতা ও ১৯১২ সালে 'রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ' বক্তৃতা চালু করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় দীনেশচন্দ্র সেন ১৯০৯ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে *History of Bengali Language and Literature* (1911), বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (১৯১৪), *বাংলার লোকসাহিত্য* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের পরিচালন সমিতির সভায় বাংলা এম.এ.-র পাঠক্রম অনুমোদিত হয়।

২. ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সর্বশেষ (২০১৫-১৬, ১৬-১৭, ১৭-১৮ ও ১৮-১৯) পাঠক্রমে দেখা গেছে যে, এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা স্নাতক-পূর্ব স্তরে Bengali Literature-1 (Ling. 1206) ও Bengali Literature-2 (Ling. 3606) শীর্ষক দুটি কোর্স অধ্যয়ন করে। এছাড়া এই স্তরে তাদের Applied Bangla (Ling. 1102) কোর্সও পাঠ করতে হয়। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ভাষাবিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থীকে স্নাতক-পূর্ব স্তরে ১২ ক্রেডিট সমমানের মোট ৩০০ নম্বরের বাংলা বিষয়ক কোর্স অধ্যয়ন করতে হয়।

৩. সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা বিষয়ে যে কোর্সটি অধ্যয়ন করে তার শিরোনাম হচ্ছে Bengali Language and Literature (SKT 316)। মোট ছয়টি ইউনিটে বিন্যস্ত এই কোর্সে তাদের বাংলা ব্যাকরণ থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার ছন্দ, নির্বাচিত কবিতা, নির্বাচিত গল্প, নির্বাচিত প্রবন্ধ পাঠ করতে হয়।

৪. ইংরেজি বিভাগে প্রবর্তিত বাংলা সাহিত্য বিষয়ক কোর্সের শিরোনাম হচ্ছে Introduction to Bangla Literature (Eng 103)। এই কোর্সে একটি আধুনিক উপন্যাস, একটি নাটক, পাঁচটি কবিতা ও চারটি ছোটগল্প পাঠদান করা হয়।

৫. ইতিহাস বিভাগে প্রবর্তিত বাংলা কোর্সটির শিরোনাম হচ্ছে History of Bangla Language and Literature (222)। এই কোর্সে মূলত ইতিহাস বিভাগের প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, গদ্যের বিকাশ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি পড়ানো হয়ে থাকে।

৬. ইসলামিক স্টাডিজ এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বাংলা বিষয়ে যে দুটি কোর্স পাঠদান করা হয়ে থাকে এদের শিরোনাম হচ্ছে যথাক্রমে Bengali (104) এবং বাংলা ভাষা (BISLM-103)। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কোর্সে বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। এই কোর্সের বিষয়ের প্রকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বিভাগের শিক্ষার্থীদের ফলিত বাংলা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পরিচয় প্রদানই এর মূল লক্ষ্য। অন্যদিকে, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার বাংলা কোর্সটি মূলত বাংলা ভাষা নির্ভর। এর বিষয়সূচি থেকে অনুমিত হয় যে, শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক বাংলা অর্থাৎ বাস্তব জীবনের প্রয়োজননির্ভর বাংলায় তাদেরকে দক্ষ করেই তোলাই এর প্রধান লক্ষ্য।

৭. গণযোগাযাগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কোর্সের শিরোনাম হল Journalistic Writing Skills: Bangla (MCJ 104)। ভাষানির্ভর এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা যেন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বাংলা ভাষা উপস্থাপনে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। অন্যদিকে, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগে Developing Language Skill (BSLP 1102) শীর্ষক কোর্সে ইংরেজির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা ২ ক্রেডিট সমমানের ৫০ নম্বরের বাংলা ব্যাকরণ ও প্রায়োগিক বাংলা পাঠ করে থাকে।

৮. ১৯৯৮ সালে যখন কলা অনুষদের সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ও ইংরেজি আবশ্যিক কোর্স হিসেবে চালু হয়, তখন প্রবন্ধকার বাংলা কোর্সের শিক্ষক হিসেবে কলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেছেন।

৯. ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, বিভাগের একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমএ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের তাদের পরীক্ষার উত্তরপত্র শুধু ইংরেজিতে লিখতে হচ্ছে।

১০. বাংলা বিভাগের সাম্প্রতিক (২০১৭-১৮, ১৮-১৯, ১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) পাঠক্রমে দেখা গেছে যে, এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা স্নাতক-পূর্ব ও স্নাতকোত্তর এই দুই স্তরে (১২০+৮) ১২৮ ক্রেডিট সমমানের (২৮+৮) ৩৬টি কোর্স অধ্যয়ন করে। এর মধ্যে ভাষা, ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে মোট ৩টি কোর্স তাদের জন্য নির্ধারিত আছে। এগুলো হল — ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ব্যাকরণ (১০৩), ভাষাবিজ্ঞান (৩০৯) এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস ও পা ুলিপি (৪০৪)।

গ্রন্থপঞ্জি

আরিফ, হাকিম (১৯৯৮)। *শিক্ষাক্রমে ভাষা ও সাহিত্য*। ঢাকা : সাহিত্য-খ্যাতি প্রকাশনী।

ইব্রাহিম, নীলিমা (১৯৭৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠন-পাঠন ও গবেষণা। [সম্পা.] নীলরতন সেন, *বাংলা-বিদ্যা চর্চা*। কল্যাণী : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮০

ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ (১৯৭৪)। স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠক্রম। [সম্পা.] নীলরতন সেন, *বাংলা-বিদ্যা চর্চা*। কল্যাণী : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৫৩-৬০

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (১৯৮৫)। *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি*। কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

মহাপাত্র, তুষারকান্তি (১৯৯৫)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় ভাষা। *ঐকতান গবেষণা পত্র*, ২য় খণ্ড (মাতৃভাষা চর্চা সংখ্যা), ক-১৫ - ক-২৩

Airey, J. & Linder, C. (2006). Language and the experience of learning physics in Sweden. European Journal of Physics 27, 553-560.

Altbach, P.G. (2007). The Imperial Tongue: English as thedominating academic language. *Economic and Political Weekly*, vol. 42(36), 3608-3611.

Brown, N.A. (2008). Language shift or maintenance? An examination of language Usage across four generations as self-reported by university age students in Belarus. *Journal of multilingual and multicultural development*, 29 (1), 1- 15.

Evans, S. & Morrisson, B. (2011). The student experience of English medium higher education in Hong Kong. Language and Education 25 (2). 147-162.

Fillmore, L.W. (1991). When learning a second language means losing the first. *Early Childhood Research Quarterly*. *6*(3), 323-346.

Fishman, J. A. (2013). Language Maintenance and Language Shift as a Filed of Inquiry: A Definition of the Field and Suggestions for its Further Development. *TCS*, 32-70.

Fishman, J.A. (1966). *Language Loyalty in the United States*. The Hague: Mouton.

Habtoor, H.A. (2012). Language Maintenance and Language Shift among Second Generation Tigrinya-speaking Eritrean Immigrants in Saudi Arabia. *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 2, No. 5, 945-955.

Holmes, J. (2013). *Introduction to Sociolinguistics*. London and New York: Routledge.

Kagwesage, A.M. (2012). Higher Education Students' Reflections on Learning in times of Academic Language Shift. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, Vol. 6, No. 2, Art. 18.

Macaro, E. & Lo, Y.Y. (2012). The medium of instruction and classroom interaction: Evidence from Hong Kong secondary schools. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 15 (1): 27-52.

Weinreich, U. (1964). *Language in Contact*. The Hague: Mouton.

Xue, J. & Zuo, W. (2013). English Dominance and Its Influence on International Communication. *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 3, No. 12, 2262-2266.